আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা গোবিন্দম্মল (মৃত) এবং অন্যান্যরা

বনাম

বৈদ্যনাথন এবং অন্যান্যরা

(২০০৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৫২৭৬)

২৩ অক্টোবর, ২০১৮

[এন.ভি. রামানা এবং মোহন এম. শান্তনগৌদার, বিচারপতিদ্বয়]

মোকদ্দমা:

স্বত্বের ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা, যাতে বিবাদীদের 'ক' তফসিলের সম্পত্তিতে (যা 'খ' তফসিলের সম্পত্তির ৫০%) প্রবেশে বাধা দেওয়া যায় – বিকল্পভাবে 'খ' তফসিলের সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশের বিভাজন চাওয়া হয়েছিল – 'খ' তফসিলের সম্পত্তি দুই ভাইয়ের মালিকানাধীন ছিল – ১৯১২ সালে 'খ' তফসিলের সম্পত্তির বিভাজন সম্পন্ন হয়েছিল – বিভাজন অনুযায়ী, 'খ' তফসিলের সম্পত্তির ৫০%, অর্থাৎ 'ক' তফসিলের সম্পত্তি, বাদীদের পূর্বপুরুষদের অংশে এসেছিল – অন্য ৫০% অংশ অন্য ভাইয়ের কাছে গিয়েছিল, যা পরবর্তীতে আদালতের নিলামে বিবাদীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পূর্বপুরুষের কাছে বিক্রি হয়েছিল – বিবাদীদের বক্তব্য ছিল যে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পূর্বপুরুষ আদালতের নিলামে সম্পূর্ণ 'খ' তফসিলের সম্পত্তি কিনেছিলেন; এবং মন্দির ও স্কুল কর্তৃক বিবাদীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুটি মামলায় (যেখানে বাদীদেরও বিবাদী করা হয়েছিল) এবং স্কুলের বিরুদ্ধে বিবাদীদের দায়ের করা পাল্টা মামলায় বিবাদীদের স্বত্ব ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে – নিম্ন আদালত মোকদ্দমার ডিক্রি দেন এবং বিকল্প বিভাজনের প্রতিকার মঞ্জুর করেন – আপিলে, হাইকোর্টের একক বিচারকের রায়ে নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করা হয় – হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মোকদ্দমার ডিক্রি দেন – আপিলে, রায় দেওয়া হলো: এটি বিতর্কিত নয় যে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে একটি রেজিস্টার্ড দলিলের মাধ্যমে 'খ' তফসিলের সম্পত্তির বিভাজন হয়েছিল – বাদীরা ৫০% অংশের উত্তরাধিকারী – অন্য ভাইয়ের ৫০% অংশ আদালতের নিলামে তোলা হয়েছিল যা বিবাদীর পিতা কিনেছিলেন – নিলামে যা বিক্রি করা যেতে পারে তা ছিল কেবল 'খ' তফসিলের সম্পত্তির ৫০%, বাদীদের অংশ অর্থাৎ 'ক' তফসিলের সম্পত্তি নয় – স্কুল কর্তৃক এবং স্কুলের বিরুদ্ধে এবং মন্দির কর্তৃক দায়ের করা মামলাগুলি বাদীদের বিরুদ্ধে বিবাদীদের স্বত্ব নির্ধারণ করেনি, কারণ তাদের মধ্যেকার স্বত্বের প্রশ্ন সেই মামলাগুলিতে বিচারাধীন ছিল না বা তা নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না – দাখিলকৃত নথি থেকে কোনো পক্ষের একচ্ছত্র দখল দেখা যায় না – বাদীরা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করেছেন যে তারা 'ক' তফসিলের সম্পত্তির মালিক।

আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা গোবিন্দম্মল (মৃত) এবং অন্যান্যরা বনাম বৈদ্যনাথন এবং অন্যান্যরা ১০৯৩

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮:

ধারা ১১-রেস জুডিকাটা-সহ-আসামীদের মধ্যে প্রযোজ্য-রায়ঃ সহ-আসামীদের মধ্যে টেস জুডিকাটার নীতি প্রয়োগের জন্য অবশ্যই আসামীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকতে হবে; বাদীকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য দ্বন্দ্বের সিদ্ধান্ত নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজনঃ এবং আসামীদের মধ্যে প্রশ্নটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-বর্তমান মামলার তথ্যে, রেস জুডিকাটার নীতি প্রযোজ্য নয়।

প্রমাণঃ

স্বীকারোক্তি-প্রমাণমূলক মূল্য-অনুষ্ঠিত হয়ঃ স্বীকারোক্তি হল সর্বোত্তম প্রমাণ-যাইহোক, স্বীকারোক্তি সবসময় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যদি না এই ধরনের স্বীকারোক্তি প্রতিরোধের নীতির জন্ম দেয়-এস্টোপেল।

মতবাদঃ

ক্যাভিএট এম্পটারের মতবাদ-এর প্রয়োগযোগ্যতা,

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: ১.১. এটা কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, ৩,১৮ একর জমির সম্পূর্ণ মালিকানা ছিল দুই ভাই 'পি' এবং 'সি'-র। এটিও কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে একটি নিবন্ধিত বিভাজনের মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছিল, যার অধীনে তাঁরা প্রত্যেকে সম্পত্তির ৫০ শতাংশ পেয়েছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত ১.৩৬ একর ছিল। সমগ্র সম্পত্তির ৫০ শতাংশ 'পি'-এর পুত্রদের ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং বাকি ৫০ শতাংশ 'সি'-র কাছে থেকে গিয়েছিল। বাদীরা সম্পত্তির ৫০ শতাংশ অর্থাৎ 'পি'-এর কাছ থেকে ১.৩৬ একর জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। মনে হয় 'সি' ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং তার বিতর্কিত সম্পত্তি আদালতের নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল। এই আদালতের নিলামে বিবাদীর বাবা ছিলেন ক্রেতা। সুতরাং, আদালতের নিলামে যা বিক্রি করা যেত তা ছিল ২.৭২ একর জমির মাত্র ৫০ শতাংশ যা 'সি 'অর্থাৎ ১.৩৬ একর ছিল। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ সম্পত্তি (অর্থাৎ' এ 'তফসিল) যা বাদীদের পূর্বসূরীর হাতে ন্যস্ত ছিল তা আদালতে বিক্রি করা যায়নি। [অনুচ্ছেদ ৫] [১১০১-ডি-ই, এফ-জি; ১১০২-এ-বি]

১.২. মামলাটির রায়ের অনুপস্থিতিতে, যা শেষ পর্যন্ত আদালত বিক্রিতে শেষ হয়, এটি বলা যায় না যে পুরো সম্পত্তিটি আদালতের বিক্রির বিষয় ছিল কি না। যেহেতু 'গ' রায়ের দেনাদার ছিল, তাই সর্বাধিক, সম্পত্তিতে কেবল তার অংশ বিক্রি করা যেতে পারে এবং ক্রেতার পক্ষে

এটি দাবি করা উন্মুক্ত নয় যে তিনি সম্পূর্ণ সম্পত্তি কিনেছেন যদিও সম্পত্তির মাত্র ৫০% রায়ের দেনাদার ছিল। ক্রেতা বিক্রেতার হাতে থাকা সম্পত্তির চেয়ে বেশি অধিকার, মালিকানা বা সুদ পেতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত ক্রেতা ঝুঁকি নেন, যদি তিনি এমন সম্পত্তি কেনেন যা রায়ের ঋণগ্রহীতার নয়। নিলামে বিক্রয়ের সময় ক্রেতা স্বত্বের সমস্ত ত্রুটি সাপেক্ষে সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং ক্যাভিট অ্যাম্প্টর (ক্রেতা সতর্ক থাকুন)-এর মতবাদটি এই ধরনের ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আদালতের নিলাম বিক্রয় পুরো সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটি বলা যাবে না যে এই ধরনের বিক্রয় সম্পূর্ণ পরিমাণে বৈধ ছিল। সর্বাধিক, এটি বলা যেতে পারে যে এটি সম্পত্তির পরিমাণ পর্যন্ত বৈধ ছিল যা "রায় ঋণগ্রহীতার দ্বারা দখল করা হয়েছিল অর্থাৎ ২.৭২ একরের মধ্যে ১.৩৬। বাকি ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ, তফসিল 'এ' সম্পত্তি বাদীদের পূর্বসূরীর মালিকানাধীন ছিল। [অনুচ্ছেদ ৫] [১১০২-সি-ই]

১.৩. বর্তমান মামলাটি কেবল বিভাজনের মামলা নয়। মূলত এটি মামলার সম্পত্তিতে বাদীর মালিকানা ঘোষণার জন্য একটি মামলা, যেমন, 'একটি তফসিল' সম্পত্তি এবং আসামীদের 'এ তফসিল' সম্পত্তির দখলে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা, যা বাদীদের পূর্বসূরীর অংশীদারিত্বের পুরো 'বি তফসিল' সম্পত্তির ৫০ শতাংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিকল্পভাবে, বাদীদের দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছিল যে যদি বাদী এবং বিবাদী যৌথ দখলে থাকে, তবে তাদের বিভাজনের ছাড় দেওয়া হবে এবং 'বি তফসিল' সম্পত্তির বাদীদের অর্ধেক অংশীদারিত্বের জন্য পৃথক দখল দেওয়া হবে। 'বি' তফসিল সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ২.৭২ একর, যেখানে 'এ' তফসিল সম্পত্তি '' বি 'তফসিল সম্পত্তির ৫০ শতাংশ, যার পরিমাপ ১.৩৬ একর, যা এফ ৯১২ সালের বিভাজনে বাদীদের পূর্বসূরীর অংশীদারিত্বে পড়েছিল। যেহেতু বিভাজন ১৯১২ সালে হয়েছিল এবং বাদীরা তাদের পূর্বসূরীর কাছ থেকে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তাই তারা' বি 'তফসিল সম্পত্তির ৫০ শতাংশের অধিকারী। ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে বাদীরা' এ 'তফসিল সম্পত্তির অধিকারী, যা ১৯১২ সালের বিভাজনে তাদের শাখায় বরাদ্দ অর্ধেক অংশ,' বি 'তফসিল সম্পত্তি থেকে। সুতরাং, বিবাদী দ্বারা উত্থাপিত রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্ন ব্যর্থ হয়। [অনুচ্ছেদ ৬] [১১০২-এফ-এইচ; ১১০৩-এ-বি]

১.৪. বাদীদের ১৯৩৩ সালে পরিচালিত নিলাম বিক্রয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই কারণ, প্রথমত, তারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া সহ সেই কার্যধারার পক্ষভুক্ত নয় এবং

দ্বিতীয়ত, নিলাম বিক্রির কারণে ক্রেতা শুধুমাত্র 'সি'-এর অধীনে থাকা অংশটি পাবেন কারণ তিনি একাই রায়ের ঋণগ্রহীতা ছিলেন। যে সম্পত্তি রায়ের ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন নয় তা একেবারেই বিক্রি করা যাবে না এবং তাই, এমনকি পুরো সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় শংসাপত্রটি ভুলভাবে জারি করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হলেও, এটি বাদীদের বাধ্য করে না কারণ তারা পুরো সম্পত্তির ৫০ শতাংশের মালিক হিসাবে রয়ে গেছে। [অনুচ্ছেদ ৭] [১১০৩-সি-ডি]

২.১. এটা সত্য যে, সিপিসির ধারা ১১-এর অধীনে, যখন একই পক্ষের মধ্যে বা যে পক্ষের অধীনে তারা বা তাদের মধ্যে কেউ দাবি করে, একই শিরোনামে মামলা দায়ের করা হয়, তখন পূর্ববর্তী মামলার ডিক্রি বাদী এবং বিবাদীর মধ্যে বা সহ-বাদী বা সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেস জুডিকাটা হিসাবে কাজ করবে। যদি কোনও বাদী সহ-আসামীদের মধ্যে কোনও মামলার চেষ্টা ও সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাঁর দাবি করা ত্রাণ পেতে না পারেন, তবে আদালত সহ-আসামীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সহ সম্পূর্ণ মামলাটি বিচার করার চেষ্টা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে এবং সহ-আসামীরা ডিক্রি দ্বারা আবদ্ধ হবে। কিন্তু যদি বাদীকে দেওয়া স্বস্তির জন্য সহ-আসামীদের মধ্যে কোনও মামলার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বা জড়িত না থাকে, তবে সহ-আসামীরা একে অপরের মতো আবদ্ধ হবে না। [অনুচ্ছেদ ১২] [১১০৬-এফ-এইচ; ১১০৭-এ]

২.২. প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী রেস জুডিকেটার নীতি সহ-আসামীদের মধ্যে ন্যায়বিচার হল যে (ক) সংশ্লিষ্ট আসামীদের মধ্যে অবশ্যই স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকতে হবে, (খ) তা অবশ্যই হতে হবে। বাদী যে স্বস্তি দাবি করেছেন তা দেওয়ার জন্য এই দ্বন্দ্বের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে এবং (গ) আসামীদের মধ্যে প্রশ্নটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিষয়ে প্রয়োজনীয় তিনটি শর্তই অনুপস্থিত। আসামীর বাবা টেম্পল এবং স্কুল দ্বারা দায়ের করা মামলায় মিলিত ছিলেন। তারা দুজনেই ঐক্যবদ্ধভাবে এই মামলাগুলির বিরোধিতা করেছিলেন। একই পরিপ্রেক্ষিতে, রেস জুডিকাটার নীতিগুলি প্রযোজ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ ৯] [১১০৪-সি-ই]

২.৩. বিবাদীর বাবার বিরুদ্ধে মন্দিরের দায়ের করা মামলায় বাদীদের বাবাকেও বিবাদী নম্বর ২ হিসাবে সাজানো হয়েছিল। এমনকি বিদ্যালয় দ্বারা দায়ের করা মামলায়, বিবাদীরা, অর্থাৎ বাদীদের বাবা এবং বিবাদীদের বাবা যৌথভাবে আবেদন করেছিলেন যে বিদ্যালয়টি সম্পত্তির মালিক নয় এবং বিবাদীরা মালিক। মন্দির এবং স্কুলের

দায়ের করা মামলা দুটিই খারিজ হয়ে যায়। ঘটনাবলী এবং আবেদনগুলির পাশাপাশি উল্লিখিত মামলাগুলিতে রেকর্ড করা প্রমাণগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে আসামীদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। যেহেতু আসামীর বাবা এবং বাদীদের বাবার মধ্যে আন্তঃ মালিকানা প্রশ্নটি ইস্যুতে ছিল না এবং তখন উত্থাপিত বিরোধগুলিতেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, "স্পষ্টতই, রেস জুডিকাটার মতবাদ এই ধরনের সহ-আসামীদের মধ্যে প্রয়োগ করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ৮] [১১০৩-এফ-এইচ; ১১০৪-বি]

মাউন্ট মুন্নি বনাম তিরলকি নাথ আকাশবাণী ১৯৩১ পিসি ১১৪; সৈয়দ মহম্মদ সাদাত আলী খান বনাম মির্জা উইকার আলী বেগ এবং অন্যান্যরা আকাশবাণী (৩০) ১৯৪৩ প্রিভি কাউন্সিল ১১৫; চন্দু লাল বনাম খলিলুর রহমান আকাশবাণী (৩৭) ১৯৫০ প্রিভি কাউন্সিল ১৭; মেহবুব সাহেব বনাম সৈয়দ ইসমাইল এবং অন্যান্যরা (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৬৯৩; সৈয়দ। মহম্মদ। সাদাত আলী খান বনাম মির্জ উইকার আলী বেগ আকাশবাণী ১৯৪৩ পিসি ১১৫; শশীবুশন প্রসাদ মিশ্র বনাম বাবুজি রাই আকাশবাণী ১৯৭০ এসসি ৮০৯; ইফিখার আহমেদ বনাম সৈয়দ মেহেরবান আলী (১৯৭৪) ২ এসসিসি ১৫১:৩ এসসিআর ৪৬৪-এর উপর নির্ভর করেছিলেন।

৩. এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, স্বীকারোক্তিই সর্বোত্তম প্রমাণ। তবে, স্বীকারোক্তিকে সর্বদা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যদি না এই ধরনের স্বীকারোক্তি বিরোধিতার নীতির জন্ম দেয়। বিরোধিতার নীতিটি উত্থাপিত হতে পারত যদি বিবাদীর পিতা বিবাদের নীতিকে আকৃষ্ট করার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বাদীর বাবার উপস্থাপনের ভিত্তিতে তার ক্ষতির জন্য কাজ করতেন, তবে যে ব্যক্তির কাছে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে তাকে অবশ্যই এই ধরনের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, এবং বিশেষ করে তার নিজের ক্ষতির জন্য। বর্তমান মামলায়, বিবাদীর বাবা তথ্যের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে তিনি কেবল সম্পত্তির ৫০ শতাংশের মালিক ছিলেন এবং যেহেতু তিনি তার ক্ষতির জন্য কাজ করেননি, তাই আটকের প্রশ্নই ওঠে না। [অনুচ্ছেদ ১৩] [১১০৭-ই-জি]

৪. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিবাদীর প্রতিকূল দখল সম্পর্কিত যুক্তি যথাযথভাবে বাতিল করেছে। রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে, ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিবাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তিনি এবং তার পূর্বসূরি-ইন-ইন-স্ট্যাট বাদী এবং তাদের

পূর্বসূরিদের বাদ দিয়ে সমগ্র সম্পত্তির উপর দখলদার ছিলেন। নথিতে এমন কোনও উপাদান পাওয়া যায় না যা জোরালোভাবে প্রকাশ করে যে, বাদীর বাবা এবং বাদী সহ সকল ব্যক্তিকে উচ্ছেদ বা বাদ দিয়ে নিলামের ক্রেতাকে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল। এই ধরনের উপাদানের অনুপস্থিতিতে, বিচার আদালত এবং ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে নিলাম ক্রেতার পক্ষে দখলের প্রতীকী বিতরণ ছিল। তবে, পরবর্তী নথিগুলি বাদী এবং বিবাদীর যৌথ দখল দেখায়। এখনও পর্যন্ত উভয় পক্ষের নাম রাজস্ব নথিতে পাওয়া যায়। নথিগুলি কোনও পক্ষের একচেটিয়া দখল দেখায় না, তবে ইঙ্গিত দেয় যে তারা যৌথ দখলে রয়েছে। রেকর্ড এবং রেকর্ডে থাকা কিছু অন্যান্য উপাদান প্রতিকূল দখল সম্পর্কিত বিবাদের বিরোধিতা করবে। [অনুচ্ছেদ ১৪] [১১০৮-বি-এফ]

মামলা প্রসঙ্গ

এআইআর ১৯৩১ পিসি ১১৪	**নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত**	**অনুচ্ছেদ ৯**
এআইআর (৩০) ১৯৪৩ প্রিভি কাউন্সিল ১১৫	নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ১০
এআইআর (৩৭) ১৯৫০ প্রিভি কাউন্সিল ১৭	নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ১১
(১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৬৯৩	নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ১২
এআইআর ১৯৪৩ পিসি ১১৫	নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ১২
এআইআর ১৯৭০ এসসি ৮০৯	নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ১২
[১৯৭৪] ৩ এসসিআর ৪৬৪	নির্ভরযোগ্য হিসেবে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ১২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৮ সালের ৫২৭৬ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০২ সালের ৭০ নং এল. পি. এ-তে মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৯.০১.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

শ্রীমতি ভি মোহনা, সিনিয়র অ্যাড., ভি. প্রভাকর, মিসেস রেবতী রাঘবন, মিসেস জ্যোতি পরাশের, এন. জে. রামচন্দর, আর. রঘুনাথ, শ্রীরাম পি., শরথ এস. জনার্দনন, কাশভি দত্ত, কে. এম. বিগ্নেশ রাম, বিজয় কুমার, অ্যাড. উপস্থিত পক্ষগুলির হয়ে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

মোহন এম শান্তনগৌদার, বিচারপতি। ১. কুড্ডালোরের অধস্তন বিচারপতির ফাইলের ওএস নং ৪৫/৮৫-এ মূল আসামীর আইনি প্রতিনিধিরা হলেন এই আদালতের আপিলকারী। সুবিধার জন্য, পক্ষগুলিকে তাদের অবস্থান অনুসারে বিচার

আদালতে পাঠানো হয়।

২. বর্তমান বাদীরা এই মোকদ্দমাটি দায়ের করেছেন, এই ঘোষণার জন্য যে 'ক' তফসিলের সম্পত্তি (যেমন আরজিতে বর্ণিত) তাদের মালিকানাধীন, অথবা বিকল্পভাবে 'খ' তফসিলের সম্পত্তিতে (যেমন আরজিতে বর্ণিত) অর্ধেক অংশের বিভাজনের জন্য, যার একটি অংশ হল 'ক' তফসিল। বাদীদের (বর্তমান আবেদনকারী) মতে, সম্পত্তিগুলি মূলত পাজানভেলু মুদালিয়ার ও চোকালিঙ্গম নামে দুই ভাইয়ের ছিল; পাজানভেলু মুদালিয়ারের নারায়ণস্বামী মুদালিয়ার ও মানিকম নামে দুই পুত্র ছিলেন। নারায়ণস্বামীর জ্ঞানসম্বন্ধম মুদালিয়ার নামে এক পুত্র ছিল। বাদীরা নারায়ণস্বামীর নাতি, অর্থাৎ জ্ঞানসম্বন্ধমের পুত্র। ২১.৭.১৯১২ তারিখে, পাজানভেলু ও চোকালিঙ্গমের বংশধরদের মধ্যে বিভাজন হয় এবং নারায়ণস্বামী (ততদিনে পাজানভেলুর মৃত্যু হওয়ায়) ও চোকালিঙ্গম তাতে স্বাক্ষর করেন। উক্ত বিভাজনে, 'ক' তফসিলের সম্পত্তি নারায়ণস্বামী ও মানিকমকে (যিনি তখন নাবালক ছিলেন) বরাদ্দ করা হয়, যখন 'খ' তফসিলে অবশিষ্ট ৫০% সম্পত্তি চোকালিঙ্গমকে বরাদ্দ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ১৯১২ সালে বিভাজনের সময় মোকদ্দমার সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ৩.১৮ একর, যা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিছু অংশ বিক্রি ও পুনর্বাসনের কারণে ২.৭২ একরে হ্রাস পায়। সুতরাং, প্রতিটি বংশের অংশ ১.৩৬ একর করে কমে যায়। সম্পত্তিটি ৬৭ নং জরিপভুক্ত ছিল। পাজানভেলু মুদালিয়ারের পুত্র নারায়ণস্বামী ও মানিকম তাদের পিতার বংশকে বরাদ্দকৃত সম্পত্তি এমনভাবে ভাগ করেছিলেন যাতে ৫.৪.১৯৩৩ তারিখে প্রদর্শনী এ-৩৯ অনুযায়ী সম্পূর্ণ 'ক' তফসিলের সম্পত্তি মানিকমকে বরাদ্দ করা হয়। মানিকমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উক্ত সম্পত্তি ১১.৯.১৯৪০ তারিখে প্রদর্শনী এ-২ অনুযায়ী তিনি আপ্পাভু মুদালিয়ারের কাছে বিক্রি করেন। ২৬.২.১৯৪২ তারিখে, আপ্পাভু মুদালিয়ার কর্তৃক ক্রয়কৃত সম্পত্তি পরবর্তীতে সম্বন্দম মুদালিয়ারের অনুকূলে বিক্রি করা হয়। ৯.২.১৯৫০ তারিখে, সম্বন্দম মুদালিয়ার কর্তৃক ক্রয়কৃত সম্পত্তি প্রদর্শনী এ-৩ অনুযায়ী নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের কাছে বিক্রি করা হয়। ১৯৬৫ সালে নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের মৃত্যুর পর, নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের নাতি হিসেবে বাদীরা সম্পূর্ণ 'ক' তফসিলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

এদিকে, চোকালিঙ্গমের অর্ধেক অংশ ২১.১২.১৯৩৩ তারিখে আদালতের নিলামে বিক্রি হয় এবং মূল বিবাদীর পিতা তা ক্রয় করেন। আদালতের নিলাম বিক্রয়ের পর দখলের হস্তান্তরের কোনো নথি নেই; যাই হোক না কেন, আদালতের বিক্রয় রায়ণ দেনাদারের অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থের বেশি কিছু প্রদান করতে পারত না, অর্থাৎ চোকালিঙ্গমের অর্ধেক স্বার্থ, যা পুনর্বাসনে নথিভুক্ত ২.৭২ একরের

মধ্যে ১.৩৬ একর। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯১২ সালে যে 'খ' তফসিলের সম্পত্তি ভাগ করা হয়েছিল, তা কখনই চিহ্নিত করা হয়নি, কারণ এটি সর্বদা একটি বসতভিটা হিসেবে ব্যবহৃত হত। ১৯৭৬ সালের পুনর্বাসন কার্যক্রমের পর, এই সম্পত্তিতে ৩টি পাট্টা নম্বর রয়েছে। বাদীদের পিতাও গৃহকর পরিশোধ করতেন। 'ক' তফসিলের সম্পত্তিতে বিবাদীর কোনো অধিকার ছিল না। বিবাদীর পিতা এবং ফলস্বরূপ বিবাদীর চোকালিঙ্গমের অর্ধেক অংশের বেশি, অর্থাৎ ১.৩৬ একরের বেশি সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার ছিল না। ৫.১১.১৯৭৮ তারিখে, বাদী এবং তাদের পিতার পরিবারে বিভাজনের সময়, প্রদর্শনী এ-৪০ অনুযায়ী 'ক' তফসিলের সম্পত্তি ২ নং বাদীর নামে বরাদ্দ করা হয়েছিল। যেহেতু বিবাদী মোকদ্দমার সম্পত্তির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে (যা 'ক' তফসিলের অন্তর্ভুক্ত) অনধিকার প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল এবং বাদীদের তা ভোগ করতে বাধা দিয়েছিল, তাই এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

বিবাদীর বক্তব্য হলো, তার পিতা ২১.১২.১৯৩৩ তারিখে আদালতের নিলামে (১৯১৮ সালের দেওয়ানী মামলা নং ২০-এর ডিক্রি জারিতে) ৬৭ নং জরিপের সম্পূর্ণ পরিমাণ, অর্থাৎ ২.৭২ একর জমি কিনেছিলেন, যা ২৯.৯.১৯৩৪ তারিখে নিশ্চিত করা হয় এবং তাকে দখল হস্তান্তর করা হয়; ১৯৪০ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর, বিবাদী দখলে রয়েছেন। ১৯৭৫ সালে, শ্রী পুথুমারিয়াম্মান মন্দির, কুরিঞ্জিপাদি উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে বিবাদী এবং জ্ঞানসম্বন্ধম মুদালিয়ারের (বাদীদের পিতা) বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের দেওয়ানী মামলা নং ৬৬ দায়ের করে। উক্ত মামলা খারিজ করে রায় দেওয়া হয় যে মন্দিরের সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার নেই এবং বিবাদী ও তার পিতারই সেই সম্পত্তির অধিকার আছে। মন্দিরের আপিলও খারিজ হয়ে যায়। সুতরাং, বিবাদী এবং তার পিতার স্বত্ব সেই মামলায় বহাল থাকে যেখানে বাদীর পিতা বিবাদীর সাথে সহ-বিবাদী ছিলেন, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে, এসকেভি উচ্চ বিদ্যালয় সম্পূর্ণ সম্পত্তির উপর তাদের স্বত্ব ঘোষণার জন্য ১৯৭৪ সালের দেওয়ানী মামলা নং ১২৮৯/১৯৭৪ দায়ের করে, এই দাবি করে যে তারা সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছে। বিবাদী এসকেভি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের দেওয়ানী মামলা নং ১২৯০ দায়ের করে। বিদ্যালয় কর্তৃক দায়ের করা ১৯৭৪ সালের দেওয়ানী মামলা নং ১২৮৯-এ বাদীর পিতা একজন বিবাদী ছিলেন, কিন্তু বিবাদী কর্তৃক দায়ের করা ১৯৭৪ সালের দেওয়ানী মামলা নং ১২৯০-এ তাকে পক্ষ করা হয়নি। উভয় মামলার যৌথ বিচার শেষে, বর্তমান বিবাদী কর্তৃক দায়ের করা মামলায় তার স্বত্ব ঘোষণা করে ডিক্রি দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয় কর্তৃক দায়ের করা মামলা খারিজ করা হয়। নিম্ন আদালতের উক্ত রায় আপিলেও বহাল থাকে। বিবাদী তার লিখিত জবাবে ১১.৯.১৯৪০ এবং ৯.২.১৯৫০ তারিখের পরবর্তী বিক্রয় দলিলগুলির বৈধতা অস্বীকার করে। এমনকি ৫.১১.১৯৭৮ তারিখের পরবর্তী বিভাজনকেও জালিয়াতিপূর্ণ ও যোগসাজশপূর্ণ লেনদেন হিসেবে আক্রমণ করা হয়। বিবাদী দাবি করেন যে আদালতের নিলামের তারিখ থেকে, অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল থেকে একটানা তিনি

সম্পূর্ণ সম্পত্তির একচ্ছত্র দখলে রয়েছেন এবং তিনি প্রতিকূল দখলের মাধ্যমে অধিকার অর্জন করেছেন। বিবাদী আরও আর্জি জানান যে, উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, দেওয়ানী আদালত কর্তৃক বিবাদীর স্বত্ব ইতিমধ্যেই দুবার ঘোষিত হয়েছে এবং সেই কারণে বর্তমান মামলাটি রেশ জুডিকাটার নীতি দ্বারা বারিত। বাদীদের যৌথ দখলের দাবি বিবাদী অস্বীকার করেন।

৩. সম্পূর্ণ বিচার শেষে, নিম্ন আদালত মামলাটির ডিক্রি দেন এবং বিকল্প বিভাজনের প্রতিকার মঞ্জুর করেন। বিবাদী কর্তৃক দায়ের করা প্রথম আপিলে, বিজ্ঞ একক বিচারক নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করেন এবং মামলা খারিজ করে দেন। বাদীদের দায়ের করা লেটার্স পেটেন্ট আপিলটি বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয় এবং ফলস্বরূপ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক মামলাটির ডিক্রি হয়।

৪. বিবাদীর/আইনগত উত্তরাধিকারীদের পক্ষে উপস্থিত শ্রী ভি. প্রভাকর দাখিল করেন যে বিভাজনের মামলাটি টিকতে পারে না, কারণ বাদীদের মতেও তাদের পূর্বপুরুষ পাজানভেলু মুদালিয়ার এবং তার ভাই চোকালিঙ্গমের শাখাগুলির মধ্যে ১৯১২ সালেই বিভাজন হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে আদালত কর্তৃক পরিচালিত নিলাম বাদীদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি; যেহেতু নিলামে সম্পূর্ণ সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছিল, তাই সম্পত্তির ক্রেতা হিসেবে বিবাদী সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী। তিনি দাখিল করেন যে মন্দির এবং বিদ্যালয় কর্তৃক সম্পূর্ণ সম্পত্তির বিষয়ে দায়ের করা পূর্ববর্তী মামলাগুলিতে, বাদীদের পিতার সাথে বিবাদীর পিতাও সহ-বিবাদী ছিলেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বা আর্জি জানিয়েছিলেন যে সম্পূর্ণ সম্পত্তি বিবাদীর পিতা আদালতের নিলামের মাধ্যমে কিনেছিলেন এবং বিবাদীর পিতা তার মালিক হিসেবে দখলে ছিলেন। এই ধরনের বিরোধ বিবাদীর পিতার অনুকূলে মীমাংসা হয়েছিল, তার স্বত্ব বহাল রেখে, এবং সেইজন্য রেশ জুডিকাটা এবং এসটপেলের নীতির প্রয়োগে বলা যেতে পারে যে বিবাদী এবং তার পিতার সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার ছিল এবং ফলস্বরূপ, বাদীদের ‘ক’ তফসিলের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার ছিল না। আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে বিবাদী এবং তার পিতা ১৯৩৩ সাল থেকে একটানা এবং প্রকাশ্যে অধিকার দাবি করে নির্বিঘ্নে দখলে ছিলেন এবং সেইজন্য নিরাপদে বলা যেতে পারে যে বিবাদী প্রতিকূল দখলের মাধ্যমে তার স্বত্ব অর্জন করেছেন।

বিপরীতক্রমে, আবেদনকারী/বাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতী ভি. মোহনা দাখিল করেন

যে বাদীদের পিতা এবং বিবাদীর পিতার মধ্যেকার আন্তঃস্বত্বের বিরোধের প্রশ্ন কোনো পূর্ববর্তী মামলায় বিচারাধীন ছিল না এবং সেইজন্য বাদীদের দাবির ক্ষেত্রে রেশ জুডিকাটার নীতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনুরূপভাবে, বিবাদীর পিতার অধিকার সম্পর্কে বাদীর পিতার স্বীকারোক্তি এসটপেল হিসেবে কাজ করতে পারত না, কারণ এটি বলা যায় না যে বিবাদী এবং তার পিতা বাদীর পিতার কোনো স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করেছিলেন; অন্যথায়ও, এই ধরনের স্বীকারোক্তি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেহেতু ১৯১২ সালে রেজিস্টার্ড পার্টিশন ডিডের মাধ্যমে দুই ভাই পাজানভেলু এবং চোকালিঙ্গমের শাখাগুলির মধ্যেকার বিভাজন নিয়ে কোনো বিরোধ ছিল না, তাই পাজানভেলু মুদালিয়ারের আইনগত উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ বাদীদের উপর ৫০% শেয়ার বর্তায়। বাদীর স্বার্থের প্রতিকূলে বাদীদের বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সময়কালের জন্য বিবাদী উক্ত সম্পত্তির ৫০% এর একচ্ছত্র দখলে ছিলেন তা প্রমাণ করার এবং আর্জি জানানোর দায়িত্ব বিবাদীর; অন্যথায় প্রতিকূল দখলের মাধ্যমে অধিকার অর্জনের প্রশ্ন উঠত না।

৫. এটি বিতর্কিত নয় যে ৩.১৮ একরের সম্পূর্ণ সম্পত্তি (যা বর্তমানে ২.৭২ একরে হ্রাস পেয়েছে) পাজানভেলু এবং চোকালিঙ্গম নামে দুই ভাইয়ের মালিকানাধীন ছিল। এটিও বিতর্কিত নয় যে দুই ভাইয়ের পরিবার, অর্থাৎ চোকালিঙ্গম এবং তার ভাইয়ের পুত্র নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের মধ্যে ২১.৭.১৯১২ তারিখে (যেহেতু ততদিনে পাজানভেলুর মৃত্যু হয়েছিল) একটি রেজিস্টার্ড পার্টিশনের মাধ্যমে বিভাজন হয়েছিল, যার অধীনে প্রত্যেকে সম্পত্তির ৫০% পেয়েছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত ১.৩৬ একর করে দাঁড়ায়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উক্ত নারায়ণস্বামী মুদালিয়ার ছিলেন পাজানভেলু মুদালিয়ারের পুত্র। পরবর্তীতে, পাজানভেলুর দুই পুত্র নারায়ণস্বামী এবং মানিকমের মধ্যে ৫.৪.১৯৩৩ তারিখে উপরোল্লিখিত ১.৩৬ একর, অর্থাৎ তাদের শাখাটিকে বরাদ্দকৃত 'ক' তফসিলের সম্পত্তির আরও বিভাজন হয়, যা ১৯৩৩ সালের বিভাজনে সম্পূর্ণরূপে মানিকমকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই শেয়ারটি পরবর্তীতে মানিকম কর্তৃক হস্তান্তরিত হয় এবং অবশেষে তার ভাই নারায়ণস্বামী কর্তৃক পুনরায় ক্রয় করা হয়। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ৫০% পাজানভেলু মুদালিয়ারের পুত্রদের অংশে পড়েছিল এবং অবশিষ্ট ৫০% চোকালিঙ্গমের কাছে ছিল। এটি বিতর্কিত নয় যে বাদীরা নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের নাতি। সুতরাং তারা সম্পত্তির ৫০%, অর্থাৎ ১.৩৬ একরের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। মনে হয় চোকালিঙ্গম ঋণে পড়েন এবং তার প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তি আদালতের নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য আনা হয়। নিলামটি ২১.১২.১৯৩৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সুব্বরায় মুদালিয়ার, অর্থাৎ বিবাদীর পিতা এই আদালতের নিলামে

ক্রেতা ছিলেন। উক্ত সুব্বরায় মুদালিয়ার ১৯৪০ সালে মারা যান এবং বিবাদীকে রেখে যান। সুতরাং, আদালতের নিলামে যা বিক্রি করা যেতে পারত তা হল চোকালিঙ্গমের মালিকানাধীন ২.৭২ একরের মাত্র ৫০%, অর্থাৎ ১.৩৬ একর। সম্পত্তির অবশিষ্ট ৫০% (অর্থাৎ 'ক' তফসিল) যা নারায়ণস্বামী এবং তার পরিবারের উপর বর্তিয়েছিল, তা আদালতের নিলামে বিক্রি করা যেত না। নিলাম কার্যক্রম রেজিস্ট্রেশন নং ২/৩৩-এ বিক্রয় নিশ্চিতকরণের আদেশ নিম্ন আদালতে দাখিল ও চিহ্নিত করা হয়েছিল, যাতে সম্পত্তির তফসিল রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কোনো পক্ষই দেওয়ানী মামলা নং ২০/১৯১৮-এর রায় দাখিল করেনি, যা শেষ পর্যন্ত ই.পি. নং ২/৩৩-এ আদালতের বিক্রয়ে শেষ হয়েছিল। সুতরাং, এই আদালত নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না যে সম্পূর্ণ সম্পত্তি আদালতের বিক্রয়ের বিষয়বস্তু ছিল কিনা। যাই হোক না কেন, যেহেতু চোকালিঙ্গম রায়ণ দেনাদার ছিলেন, তাই সর্বাধিক তার সম্পত্তির অংশ বিক্রি করা যেত এবং ক্রেতার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া সমীচীন নয় যে তিনি সম্পূর্ণ সম্পত্তি কিনেছেন, যদিও সম্পত্তির মাত্র ৫০% রায়ণ দেনদারের মালিকানাধীন ছিল। বিক্রেতার উপর যা বর্তেছে তার চেয়ে বেশি অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ ক্রেতা পেতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত ক্রেতা ঝুঁকি নেন, যদি তিনি এমন সম্পত্তি কেনেন যা রায়ণ দেনদারের নয়। নিলামে ক্রেতা সম্পত্তির সমস্ত ত্রুটি সহকারে গ্রহণ করেন এবং ক্রেতার সাবধান নীতি এই ধরনের ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে সম্পূর্ণ সম্পত্তির জন্য আদালতের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবুও বলা যায় না যে উক্ত বিক্রয় সম্পূর্ণ পরিমাণে বৈধ ছিল। সর্বাধিক, এটি বলা যেতে পারে যে এটি রায়ণ দেনদার, অর্থাৎ শ্রী চোকালিঙ্গমের মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ পর্যন্ত বৈধ ছিল, অর্থাৎ ২.৭২ একরের মধ্যে ১.৩৬ একর। অবশিষ্ট ৫০%, অর্থাৎ 'ক' তফসিলের সম্পত্তি নারায়ণস্বামী মুদালিয়ার এবং তার আইনগত প্রতিনিধিদের মালিকানাধীন ছিল।

৬. যে মামলা থেকে এই আপিলটি উদ্‌ভূত হয়েছে তা কেবল একটি বিভাজনের মামলা নয়। অন্যদিকে, প্রাথমিকভাবে এটি মোকদ্দমার সম্পত্তির, অর্থাৎ 'ক' তফসিলের সম্পত্তির উপর বাদীদের স্বত্ব ঘোষণার এবং 'ক' তফসিলের সম্পত্তিতে বিবাদীদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা, যা নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের অংশে আসা সম্পূর্ণ 'খ' তফসিলের সম্পত্তির ৫০% ছাড়া আর কিছুই নয়। বিকল্পভাবে, বাদীরা প্রার্থনা করেছিলেন যে যদি বাদী এবং বিবাদীকে যৌথ দখলে পাওয়া যায়, তবে তাদের 'খ' তফসিলের সম্পত্তিতে বাদীদের অর্ধেক অংশের বিভাজন এবং পৃথক দখলের প্রতিকার মঞ্জুর করা হোক। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে 'খ' তফসিলের সম্পত্তির মোট পরিমাণ ২.৭২ একর, যেখানে 'ক' তফসিলের সম্পত্তি 'খ' তফসিলের সম্পত্তির ৫০%, যার পরিমাণ ১.৩৬ একর

এবং যা ১৯১২ সালের বিভাজনে নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের অংশে এসেছিল। যেহেতু ১৯১২ সালে চোকালিঙ্গম এবং নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের (পাজানভেলুর পুত্র হওয়ায়) মধ্যে বিভাজন হয়েছিল, এবং যেহেতু বাদীরা নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের কাছ থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তাই তারা 'খ' তফসিলের সম্পত্তিতে ৫০% অংশের অধিকারী। ডিভিশন বেঞ্চ যথার্থই রায় দিয়েছে যে বাদীরা 'ক' তফসিলের সম্পত্তির অধিকারী, যা ১৯১২ সালের বিভাজনে 'খ' তফসিলের সম্পত্তি থেকে তাদের শাখাকে বরাদ্দকৃত অর্ধেক অংশ। সুতরাং, বিবাদী কর্তৃক উত্থাপিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নটি ব্যর্থ হয়।

৭. বাদীদের ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত নিলামকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রথমত, তারা সেই কার্যধারাগুলির, যার মধ্যে নির্বাহ কার্যধারা এবং আদালতের নিলামও অন্তর্ভুক্ত, পক্ষভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, নিলামের মাধ্যমে ক্রেতা কেবলমাত্র চোকালিঙ্গমের উপর বর্তানো অংশটিই পাবেন, কারণ চোকালিঙ্গম একাই রায়ণ দেনাদার ছিলেন। যে সম্পত্তি রায়ণ দেনদারের মালিকানাধীন নয়, তা আদৌ বিক্রি করা যায় না এবং সেইজন্য, এমনকি যদি ধরেও নেওয়া হয় যে সম্পূর্ণ সম্পত্তির জন্য ভুলভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হয়েছে, তবুও তা বাদীদের বাধ্য করে না, কারণ তারা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ৫০% এর মালিকানা বজায় রেখেছেন।

৮. এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে মন্দিরের পক্ষ থেকে বিবাদীর পিতার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় বাদীর পিতাকেও ২ নং বিবাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটিও বিতর্কিত নয় যে বাদীর পিতা এবং বিবাদীর পিতা একজন সাধারণ আইনজীবীর মাধ্যমে একটি সাধারণ লিখিত জবাব দাখিল করে আর্জি জানিয়েছিলেন যে মন্দির সম্পত্তির মালিক নয় এবং ১ নং বিবাদী সম্পত্তির মালিক। এটিও বিতর্কিত নয় যে বাদীর পিতা উক্ত মামলায় স্বীকার করেছিলেন যে উক্ত মামলার ১ নং বিবাদী, অর্থাৎ এখানকার বিবাদীর পিতা, সম্পত্তির মালিক ছিলেন। একইভাবে, বিদ্যালয় কর্তৃক দায়ের করা মামলায় বাদীর পিতাকেও বিবাদীর পিতার সাথে অন্যতম বিবাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত মামলাতেও একটি সাধারণ লিখিত জবাব দাখিল করা হয়েছিল। এমনকি বিদ্যালয় কর্তৃক দায়ের করা মামলায়, সেখানকার বিবাদীগণ, অর্থাৎ এখানকার বাদীর পিতা এবং এখানকার বিবাদীর পিতা যৌথভাবে আর্জি জানিয়েছিলেন যে বিদ্যালয় সম্পত্তির মালিক নয় এবং বিবাদীগণই মালিক। মন্দির এবং বিদ্যালয় উভয় কর্তৃক দায়ের করা মামলা খারিজ করে রায় দেওয়া হয় যে মন্দির এবং বিদ্যালয় কেউই সম্পত্তির মালিক নয়। উপরোক্ত তথ্য এবং আর্জিগুলির পাশাপাশি উক্ত মামলাগুলিতে নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে এটি স্পষ্ট যে বিবাদীদের

মধ্যে কোনো আন্তঃবিরোধ ছিল না। অন্য কথায়, ঐ দুটি মামলায় বাদীর পিতা এবং বিবাদীর পিতার মধ্যে স্বত্ব নিয়ে কোনো প্রকার বিরোধ ছিল না। ঐ মামলাগুলিতে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল যে অধিকার দাবি করা তৃতীয় পক্ষগুলি সম্পত্তির অধিকারী কিনা। যেহেতু বিবাদীর পিতা এবং বাদীর পিতার মধ্যেকার আন্তঃস্বত্বের প্রশ্ন বিচারাধীন ছিল না এবং তৎকালীন উত্থাপিত বিরোধগুলিতে তা নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না, তাই স্পষ্টতই, এই ধরনের সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেশ জুডিকাটার নীতি প্রয়োগ করা যায় না।

৯. তবে, এমন কিছু পরিস্থিতি বিদ্যমান যেখানে সহ-বিবাদীদের মধ্যেও রেশ জুডিকাটার নীতি প্রয়োগ হতে পারে। এটি ইংরেজি আদালত এবং আমাদের আদালতগুলি এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে স্বীকৃতি দিয়েছে। সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেশ জুডিকাটার নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি হল: (ক) সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকতে হবে, (খ) বাদী যে প্রতিকার দাবি করছেন তা দেওয়ার জন্য এই সংঘাতের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয় হতে হবে এবং (গ) বিবাদীদের মধ্যেকার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয়ে থাকতে হবে। বর্তমান মামলায় এই তিনটি প্রয়োজনীয় শর্তের অভাব রয়েছে। প্রথমত, মন্দির এবং বিদ্যালয় কর্তৃক দায়ের করা মামলাগুলিতে বিবাদীদের মধ্যে কোনো স্বার্থের সংঘাত ছিল না। দ্বিতীয়ত, যেহেতু কোনো সংঘাত ছিল না, তাই বাদী মন্দির বা বিদ্যালয়কে প্রতিকার দেওয়ার জন্য সেই মামলাগুলিতে বিবাদীদের মধ্যে কোনো সংঘাতের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয় ছিল না। বরং, বাদীর পিতা এবং বিবাদীর পিতা মন্দির এবং বিদ্যালয় কর্তৃক দায়ের করা সেই মামলাগুলিতে যোগসাজশ করেছিলেন। তারা উভয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে সেই মামলাগুলির বিরোধিতা করেছিলেন। এমতাবস্থায়, রেশ জুডিকাটার নীতি প্রযোজ্য হবে না। প্রিভি কাউন্সিল এমটি. মুন্নি বনাম তিরলোকি নাথ, এআইআর ১৯৩১ পিসি ১১৪-এর মামলায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছে:

> "রেশ জুডিকাটার নীতি ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারায় স্থান পেয়েছে, তবে এই বোর্ড বহুবার রায় দিয়েছে যে সেখানে এর বিবৃতি সম্পূর্ণ নয়; এর সর্বশেষ স্বীকৃতি কালীপদ দে বনাম দ্বিজপদ দাস [এআইআর ১৯৮০ পিসি ২২]-এ পাওয়া যায়। যে সাধারণ নীতিগুলির ভিত্তিতে এই নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তার জন্য এই দেশের সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করা বৈধ: সুরজমণি দায়ী বনাম সুদামুণ্ড মহাপাত্র [আই.এ. সাপ, খণ্ড ২, ২১২], কৃষ্ণ বিহারী রায় বনাম বনওয়ারী লাল রায় [(১৮৭৪) ১ ক্যাল. ১৪৪], রাজা রণ বাহাদুর সিং বনাম শ্রীমতি লাছো কুয়ের [(১৮৮৫) ১১ ক্যাল. ৩০১]। সহ-বিবাদীদের মধ্যেও রেশ জুডিকাটা থাকতে পারে, এটি ইংরেজি আদালত এবং ভারতীয় সিদ্ধান্তের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় স্বীকৃত হয়েছে। এই নীতির এই শাখাটি যে শর্তগুলির

অধীনে প্রয়োগ করা উচিত তা উইগ্রাম ভি.সি., কটিংহাম বনাম আর্ল অফ শ্রুসবারি [(১৮৪৩) ৩ হেয়ার ৬২৭]-এর ৬৩৮ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করেছেন:"

"যদি কোনো বাদী সহ-বিবাদীদের মধ্যে একটি মামলার বিচার ও সিদ্ধান্ত ছাড়া তার অধিকার লাভ করতে না পারে, তবে আদালত সেই মামলার বিচার ও সিদ্ধান্ত নেবে এবং সহ-বিবাদীরা আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু যদি বাদীকে প্রদত্ত প্রতিকারের জন্য সহ-বিবাদীদের মধ্যে কোনো মামলার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন না হয় বা তার সাথে জড়িত না থাকে, তবে সহ-বিবাদীরা একে অপরের মধ্যে এমন কোনো কার্যধারায় আবদ্ধ থাকবে না যা কেবলমাত্র বাদীর প্রাপ্ত ডিক্রি জারির জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে।"

আইনের এই বিবৃতিটি বহু ভারতীয় মামলায় গৃহীত ও অনুসরণ করা হয়েছে: আহমদ আলী বনাম নাজাবত খান [(১৮৯৫) ১৮ এলা. ৬৫], রামচন্দ্র নারায়ণ বনাম নারায়ণ মহাদেব [(১৮৮৭) ১১ বোম. ২১৬], মাগনিরাম বনাম মেহদি হোসেন খান [(১৯০৪) ৩১ ক্যাল. ৯৫]। লর্ডশিপগণের মতে, এটি দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেশ জুডিকাটার নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা এটিকে সঠিক মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং, এই ধরনের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত আবশ্যক: (১) সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকতে হবে; (২) বাদী যে প্রতিকার দাবি করছেন তা দেওয়ার জন্য এই সংঘাতের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয় হতে হবে; এবং (৩) বিবাদীদের মধ্যেকার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয়ে থাকতে হবে।"

(গুরুত্ব যোগ করা হলো)

১০. পুনরায়, সৈয়দ মোহাম্মদ সাদাত আলী খান বনাম মির্জা ওয়িকার আলী বেগ এবং অন্যান্য, এআইআর (৩০) ১৯৪৩ প্রিভি কাউন্সিল ১১৫-এর মামলায় একই নীতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল, যেখানে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিল:

"সহ-বিবাদীদের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্তকে রেশ জুডিকাটা হিসেবে কাজ করতে হলে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে: (১) সেই সহ-বিবাদীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকতে হবে; (২) বাদী যে প্রতিকার দাবি করছেন তা দেওয়ার জন্য সেই সংঘাতের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয় হতে হবে; এবং (৩) সহ-বিবাদীদের মধ্যেকার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয়ে থাকতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিচারাধীন মামলায় প্রথম ও তৃতীয় শর্ত পূরণ হয়েছিল। দ্বিতীয় শর্ত বিদ্যমান ছিল কিনা, সেটাই উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন। প্রধান আদালত তাদের রায়ের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে প্রদর্শিত

কারণগুলির জন্য ধরে নিয়েছিলেন যে এটি বিদ্যমান ছিল না।"

১১. চান্দু লাল বনাম খলিলুর রহমান, এআইআর (৩৭) ১৯৫০ প্রিভি কাউন্সিল ১৭-এর মামলায় প্রায় একই নীতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল, যেখানে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিল:

> "মুন্নি বিবি এবং অন্য বনাম তিরলোকি নাথ, ৫৮ আই.এ. ১৫৮: [এআইআর (১৮) ১৯৩১ পিসি ১১৪]-এর মামলায়, পূর্ববর্তী মামলায় সহ-বিবাদী থাকা পক্ষগুলির মধ্যে রেশ জুডিকাটার নীতি প্রয়োগের শর্তগুলি নিম্নরূপভাবে বিবৃত করা হয়েছে: (১) সহ-বিবাদীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকতে হবে, (২) বাদীকে উপযুক্ত প্রতিকার দেওয়ার জন্য সেই সংঘাতের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয় হতে হবে এবং (৩) সহ-বিবাদীদের মধ্যে সেই প্রশ্নের একটি সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। এটি যোগ করা যেতে পারে যে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে এটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদি সেই পক্ষ পূর্ববর্তী মামলায় উপস্থিত না হয়ে প্রশ্নটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে থাকে, তবুও নীতিটি প্রয়োগ হতে পারে। তবে এর সাথে এই যোগ্যতা যোগ করতে হবে যে, যদি এই ধরনের কোনো পক্ষ পূর্ববর্তী রায়ের দ্বারা আবদ্ধ হতে হয়, তবে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে যে তার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি বিচারাধীন ছিল এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই বিষয়ে তার কাছে নোটিশ ছিল বা তাকে নোটিশ প্রাপ্ত বলে গণ্য করা উচিত।"
>
> (গুরুত্ব যোগ করা হলো)

এমডি. সাদাত আলী (উপরোক্ত) মামলায়, যদিও প্রথম এবং তৃতীয় শর্ত পূরণ হয়েছিল, দ্বিতীয় শর্ত পূরণ হয়নি এবং সেইজন্য রায় দেওয়া হয়েছিল যে রেশ জুডিকাটার নীতি প্রযোজ্য হবে না, যার অর্থ হল রেশ জুডিকাটার নীতি প্রয়োগের জন্য তিনটি শর্তই পূরণ করতে হবে।

১২. এটি সত্য যে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার অধীনে, যখন কোনো বিষয় পূর্ববর্তী মামলায় একই পক্ষগণের মধ্যে বা যাদের অধীনে তারা বা তাদের কেউ একই স্বত্বে মামলা পরিচালনা করছেন তাদের মধ্যে সরাসরি বা মূলত বিচারাধীন ছিল, তখন পূর্ববর্তী মামলার ডিক্রি বাদী এবং বিবাদী বা সহ-বাদী বা সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেশ জুডিকাটা হিসেবে কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পি কর্তৃক ডি১ এবং ডি২-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায়, ডি১ এবং ডি২-এর মধ্যে বিষয়টি সরাসরি এবং মূলত বিচারাধীন থাকে এবং পি-কে প্রতিকার দেওয়ার জন্য মামলার মীমাংসা করার জন্য সেই বিষয়ের উপর বিচার প্রয়োজনীয় হয়, তবে সেই বিচার ডি১ এবং ডি২-এর মধ্যে পরবর্তী মামলাগুলিতে রেশ জুডিকাটা হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তাদের যে কেউ বাদী বা বিবাদী হোক না কেন। অন্য কথায়, যদি কোনো বাদী সহ-বিবাদীদের মধ্যে একটি মামলার বিচার ও সিদ্ধান্ত ছাড়া তার দাবি করা প্রতিকার না পায়, তবে আদালত সহ-বিবাদীদের মধ্যে

স্বার্থের সংঘাত সহ সম্পূর্ণ মামলার বিচার ও সিদ্ধান্ত নেবে এবং সহ-বিবাদীরা ডিক্রির দ্বারা আবদ্ধ থাকবে। তবে যদি বাদীকে প্রদত্ত প্রতিকারের জন্য সহ-বিবাদীদের মধ্যে কোনো মামলার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন না হয় বা তার সাথে জড়িত না থাকে, তবে সহ-বিবাদীরা একে অপরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। এই আদালত মাহবুব সাহেব বনাম সৈয়দ ইসমাইল এবং অন্যান্য, (১৯৯৫) ৩ এসসিসি ৬৯৩-এর মামলায় সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেশ জুডিকাটার নীতি প্রযোজ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে রায় দেয় যে নিম্নলিখিত চারটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যথা,

> "(১) সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকতে হবে;
>
> (২) বাদী যে প্রতিকার দাবি করছেন তা দেওয়ার জন্য সেই সংঘাতের মীমাংসা করা প্রয়োজনীয় হতে হবে;
>
> (৩) বিবাদীদের মধ্যেকার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হয়ে থাকতে হবে; এবং
>
> (৪) সহ-বিবাদীরা পূর্ববর্তী মামলায় প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত পক্ষ ছিলেন।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য, এই আদালত সৈয়দ মোহাম্মদ সাদাত আলী খান বনাম মির্জা ওয়িকার আলী বেগ, এআইআর ১৯৪৩ পিসি ১১৫; শশীভূষণ প্রসাদ মিশ্র বনাম বাবুজি রাই, এআইআর ১৯৭০ এসসি ৮০৯ এবং ইফতেখার আহমেদ বনাম সৈয়দ মেহেরবান আলী, (১৯৭৪) ২ এসসিসি ১৫১-এর মামলাগুলির রায়ের উপর নির্ভর করেছিল।

১৩. বিবাদীর আইনজীবীর বাদীর পিতার পূর্বোক্ত পূর্ববর্তী মামলাগুলির আর্জিতে এবং তার জবানবন্দিতে বিবাদীর পিতার স্বত্ব সম্পর্কে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উত্থাপিত এসটপেলের প্রশ্নে আসা যাক, এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে একটি স্বীকারোক্তি সর্বোত্তম প্রমাণ। তবে, যদি না সেই স্বীকারোক্তি এসটপেলের নীতির জন্ম দেয়, তবে একটি স্বীকারোক্তি সর্বদা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এসটপেলের নীতি তখনই উদ্ভূত হতে পারত যদি বিবাদীর পিতা বাদীর পিতার উপস্থাপনার ভিত্তিতে তার স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করে থাকেন, কারণ এসটপেলের নীতি আকৃষ্ট করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হল, যাকে উপস্থাপনা করা হয়েছে তাকে সেই উপস্থাপনার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং বিশেষভাবে তার নিজের ক্ষতির জন্য। বর্তমান মামলায়, বিবাদীর পিতা ঘটনাগুলির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে তিনি সম্পত্তির কেবলমাত্র ৫০% এর মালিক এবং যেহেতু তিনি তার ক্ষতির জন্য কাজ করেননি, তাই এসটপেলের প্রশ্ন ওঠে না। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে নিলাম ক্রয়ে, নিলাম ক্রেতা রায়ণ দেনদারের চেয়ে বেশি কোনো অধিকার অর্জন করেন না। যেহেতু এই মামলায় সহ-বিবাদীদের মধ্যে রেশ জুডিকাটার নীতি প্রযোজ্য নয় এবং যেহেতু একটি সাধারণ স্বীকারোক্তি এসটপেল হিসেবে

কাজ করে না, তাই এই ধরনের স্বীকারোক্তি বিবাদীর পিতার এবং ফলস্বরূপ বিবাদীর অনুকূলে কোনো স্বত্ব তৈরি করে না বা হস্তান্তর করে না। অন্যদিকে, এটি স্পষ্ট যে বিবাদীর বাবার সম্পত্তির অর্ধেকের উপর অধিকার ছিল, যা তিনি কিনেছিলেন।

১৪. ডিভিশন বেঞ্চ যথার্থই বিবাদীর প্রতিকূল দখলের যুক্ত খণ্ডন করেছে। নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে, নিম্ন আদালত এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিবাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তিনি এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট পূর্বপুরুষ বাদীদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ সম্পত্তির দখলে ছিলেন। এমন কোনো উপাদান নথিতে পাওয়া যায়নি যা জোরালোভাবে প্রকাশ করে যে বাদীর পিতা এবং বাদী সহ সকল ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করে বা তাদের বাদ দিয়ে নিলাম ক্রেতাকে সম্পত্তির শারীরিক দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল। এই ধরনের উপাদানের অভাবে, নিম্ন আদালত এবং ডিভিশন বেঞ্চ যথার্থই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে প্রতীকী দখল হস্তান্তর করা হয়েছিল। তবে, পরবর্তী নথিগুলি বাদী এবং বিবাদীর যৌথ দখল দেখায়। এখনও রাজস্ব রেকর্ডে উভয় পক্ষের নাম পাওয়া যায়। নথিগুলি কোনো পক্ষের একচ্ছত্র দখল দেখায় না, বরং ইঙ্গিত দেয় যে তারা যৌথ দখলে রয়েছে। প্রদর্শনী এ-৭, এ-৮ এবং এ-৯ হল পাট্টা যা রাজস্ব রেকর্ডে উভয় পক্ষের নাম প্রকাশ করে। এমনকি গৃহকর রশিদগুলিও বাদীর পূর্বপুরুষের নামে রয়েছে। নারায়ণস্বামী মুদালিয়ারের মৃত্যুর পর এবং প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তি, অর্থাৎ 'ক' তফসিল ২ নং বাদীর অনুকূলে প্রদর্শনী এ-৪০ অনুযায়ী বরাদ্দ করার পর, 'ক' তফসিলের সম্পত্তি ইতিমধ্যেই বাদীদের মধ্যে আন্তঃবিভাজনের বিষয় হয়েছে। উপরোক্ত রেকর্ড এবং নথিতে থাকা অন্যান্য কিছু উপাদান প্রতিকূল দখল সংক্রান্ত বিবাদীর যুক্তিকে নস্যাৎ করে। বাদীরা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করেছেন যে তারা 'ক' তফসিলের সম্পত্তির মালিক, অর্থাৎ ১৯১২ সালে বিভক্ত সম্পত্তির ৫০%, যা পরিশেষে উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রী নারায়ণস্বামীর (বাদীর পিতামহ) অংশে পড়েছিল।

১৫. এমতাবস্থায়, আমরা এল.পি.এ. নং ৭০/২০০২-এ ২৯.০১.২০০৭ তারিখে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। তদনুসারে বর্তমান আপিলটি ব্যর্থ হয় এবং এতদ্বারা খারিজ করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল খারিজ করা হয়।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar